'আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী' হওয়ার ডাক

[জামায়াতে আহ্‌মদীয়ার বর্তমান ইমাম—
সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক
২৮-১-৮৩ইং তারিখে প্রদত্ত জুমুআর খুৎবা]

প্রকাশনায় :
প্রণয়ন ও প্রকাশনা বিভাগ,
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া,
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রথম সংস্করণ :
১২৫০ কপি
১লা মার্চ, ১৯৮৮ইং

মুদ্রণে :
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস
৪ নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা—১২১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী হওয়ার ডাক

* "যুগ অতি দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবমান, উহার পরিত্রাণের ব্যবস্থা আমাদিগকেই করিতে হইবে।"

* "বিশ্বব্যাপী ইসলামকে জয়যুক্ত করার দাবী ও চাহিদা অতি ব্যাপক ও সুদূর প্রসারিত। ইহা এক গুরু দায়িত্ব যাহা জামায়াতে আহ্‌মদীয়ার স্কন্ধে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

* 'বন্ধুদের উচিত তাঁহারা যেন সকলেই "আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী" হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন।'

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা হাম-মিম-আল-সিজদা-এর নিম্নরূপ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন :

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين (ايت : ٣٤)

তারপর বলেন : জগতে কোন না কোন লক্ষ্য-বস্তুর দিকে যত লোকই আহ্বান করিয়া থাকে তাহাদের সকলের মধ্যে

খোদাতা'লার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির আওয়াজ বা আহ্বানই সর্বাপেক্ষা আদরনীয়, পসন্দনীয় এবং প্রশংসনীয় হইয়া থাকে, যে তাহার রব্বের দিকে আহ্বান করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার সঙ্গে আল্লাহ্তা'লা কিছু শর্তও নির্ধারণ করিয়াছেন।

প্রথম হইল আহ্বানকারী যেন তাহার রব্বের দিকেই আহ্বানে নিয়োজিত থাকে। তাহার কথা বা দাবী যেন তাহার আমল বা কর্মের দ্বারা সমর্থনপুষ্ট ও সত্যায়িত হয় যে, সে তাহার রব্বের দিকেই আহ্বান করিতেছে। সে তাহার কোন স্বার্থ, বাসনা-কামনা বা শয়তানী ভাব-ধারণার দিকে আহ্বান করিতেছে না। তাহার আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম যেন তাহার কথা বা আহ্বানকে অধিক সুশোভিত করিতে থাকে। কেননা আমল ঘৃণ্য হইলে কথার সৌন্দর্য ও মাধুর্য তিরোহিত হইয়া যায়।

সুতরাং আল্লাহ্তা'লা আমলে-সালেহ্ বা সৎকর্মের শর্ত আরোপ এবং ইহার সঙ্গে আরও একটি শর্ত সংযোজিত করিয়াছেন এই যে, (বলিয়াছেনঃ) وقال انني من المسلمين "এতদসঙ্গে এ দাবীও করিবে যে, আমি মুসলিম-গণের অন্তর্ভুক্ত।" কেননা যদিও সে আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী হয় এবং সৎকর্মেরও অধিকারী হয় কিন্তু সে যদি ইসলামের দিকে দাওয়াত না দেয় এবং নিজেকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াও নির্ধারণ না করে, তাহা হইলে এই তৃতীয় শর্তটি বাতিল হইয়া যাইবে এবং ইহা তাহার কথার সৌন্দর্যকে বাতিল ও নস্যাৎ করিয়া দিবে।

মোট কথা, প্রতি ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্‌তা'লার দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে এক সর্বাঙ্গ-সুন্দর আহ্বানকারীর আদর্শ ও ভূমিকা পালন করিতে হইবে এবং যে চায় যেন সে মানুষকে আহ্বান করিলে খোদাতা'লার প্রেমের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয় এবং তাহার কথা বা আহ্বান সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়—তাহার বেলায় কুরআন করীমের শিক্ষানুযায়ী এই শর্তগুলি অনিবার্য ও বাধ্যতা-মূলক। সে যেন মানুষকে তাহার রব্বের দিকে ডাকে, তাহার আহ্বানের বিষয়বস্তু যেন তাহার নিজের বাসনা-কামনা বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যাবলী না হয় এবং খোদার নামে ডাক দেওয়ার অলক্ষ্যে তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে। বরং ঐকান্তিক-রূপে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই যেন সে মানুষকে আহ্বান করে। যেমন, জামায়াতে আহ্‌মদীয়া বিশ্বের সব মানুষকে একমাত্র খোদাতা'লার দিকেই আহ্বান জানাইতেছে। যদি কোথায়ও আল্লাহ্‌র দিকে এই আহ্বানের পিছনে উদ্দেশ্য হইয়া থাকে যে, আমাদের সংখ্যা যেন বাড়িয়া যায় এবং আমরা যেন পার্থিব বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা আর আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান হিসাবে অবশিষ্ট থাকিবে না। আমাদের দাওয়াত হইল কেবল আল্লাহ্‌তা'লার উদ্দেশ্যে। সেজন্য প্রত্যেক আহ্‌মদীর উচিত আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যকে ইহাতে শামিল বা সংমিশ্রিত না করা, যাহাতে তাহার দাবী কলুষিত না হইয়া কোন ব্যক্তি বিশেষ যেন তাহার অভীষ্ট লক্ষ্য না হয়, তেমনি না কোন পার্টি না অন্য কোন

প্রকারের 'ইলাহ' (الٰہ), আর না কোন অভিলাস ও বাসনা তাহার লক্ষ্য-বস্তু হয়। বরং সে যেন খালেসরূপে শুধু আল্লাহ্-তা'লার দিকে আহ্বানে নিয়োজিত থাকে এবং তাহার সৎকম ইহার তসদীক্ বা সাক্ষ্যদান করে যে, সুনিশ্চিতভাবে সে তাহার রব্বের দিকেই ডাকিতেছে।

'আমলে-সালেহ্' বলিতে কি বুঝায়? এ প্রসঙ্গে রব্বের দিকে আহ্বানকারীদের সহিত আল্লাহ্তা'লা একটি সওদার কথা ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেই অনুপাতে 'আমলে-সালেহ্' এর সারকথা ঐ সওদাটি বর্ণনা করার মাধ্যমে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যেমন :

ان الله اشترا ى من المؤ منين انفسهم واموا لهم بان لهم الجنة (سو رة التو بة : ١١١)

অর্থাৎ—"ঐ সকল লোক যাহারা আমার হইয়া গিয়াছে, তাহারা হইল আমার পানে আহ্বানকারী লোক. যাহারা ঐকান্তিক ভাবে আমার সহিত একটি সওদা করিয়াছে, তাহাদের সেই সওদাটি হইল এই যে, "ইন্নাল্লাহাশ্তরা মিনাল মু'মেনীনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম"—খোদাতা'লা তাহাদের প্রাণ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন এবং তাহাদের ধন-সম্পদও ক্রয় করিয়াছেন, "বে আন্না লাহুমুল্-জান্নাহ্"—আর ইহার বিনিময়ে আল্লাহ্তা'লা তাহাদিগকে জান্নাত দান করিবেন।

এই আয়াতের কয়েকটি গভীর মর্মার্থ ও তত্ত্বগত স্তর রহিয়াছে, সেজন্য ইহার বিভিন্ন তফসীর এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা

করা যাইতে পারে কিন্তু এই মওকাতে আমি বিশেষভাবে এ কথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইবার উদ্দেশ্যে আয়াতটি পাঠ করিতেছি যে, প্রাণ ও ধন-সম্পদ উভয়ই হইল এই সওদাটির অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু প্রাণ এই সওদার শর্ত পূরণ করিতে পারিবে না আর কেবল ধন-সম্পদও এ সওদার শর্ত পূরণ করিতে পারিবে না। সুতরাং যাহারা আমলে-সালেহ্-এর দাবীদার তাহারা যদি উল্লিখিত দুইটি জিনিসের মধ্যে একটিরও অভাব ঘটায় তাহা হইলে তাঁহাদের সৎকর্মে দোষ-ত্রুটির উদ্ভব ঘটিয়া যাইবে এবং সেই অনুপাতে আল্লাহ্‌র দিকে তাহাদের আহ্বান ত্রুটি-যুক্ত হইয়া পড়িবে।

যতটুকু মালী (আর্থিক) কুরবানীর সম্পর্ক, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে জামায়াতে আহ্‌মদীয়া জগৎ ব্যাপী অপরাপর সকল দল বা জামায়াতের মধ্যে—তাহারা যে কোন ধর্ম বা রাজনৈতিক মতাদর্শের সহিত সম্পর্কযুক্ত হউক না কেন এক সুপ্রকাশমান বৈশিষ্ট্য সহকারে সকলের চাইতে অগ্রগামী রহিয়াছে। আর যতটুকু 'নফ্‌স' বা প্রাণ সম্বন্ধীয় কুরবানীর সম্পর্ক, নিঃসন্দেহে সে ক্ষেত্রেও জামায়াতে আহ্‌মদীয়া দুনিয়ার অন্যান্য জামায়াত বা দল অপেক্ষা অগ্রবর্তী রহিয়াছে। যদিও অপরাপর জামায়াতগুলির কুরবানীর মানদণ্ড ভিন্নতর কিন্তু আমাদের কুরবানীর মানদণ্ড তাহাদের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উন্নততর। আর এতই উন্নততর যে তাহাদের কুরবানীর মানদণ্ডের মোকাবিলায় আমাদের কুরবানীর মানদণ্ডের তুলনা-

মূলক সম্পর্ক হইল এমনই যেমন যমীন ও আসমানের ব্যবধান। কেননা আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিটি মু'মেনের সহিত উক্ত সওদাটি করিয়াছেন। তিনি একটি জামায়াতের কেবল কতিপয় ব্যক্তিতে সন্তুষ্ট নহেন, মাত্র কয়েকজন আহ্বানকারীতেই সন্তুষ্ট নহেন। বরং মুসলমানের সংগাতে এ কথাটি তিনি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, তুমি যদি মুসলমান হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে অনিবার্যরূপে আল্লাহ্‌তা'লার দিকে মানুষদের আহ্বান জানাইতে হইবে এবং তোমাকে ইসলাম গোপন করার অনুমতি দেওয়া যাইবে না। যদি তুমি ইসলাম গোপন রাখিয়া খোদার দিকে ডাক, তাহা হইলে খোদার নিকট তোমার কথা বা আহ্বান শোভনীয় কথা বা আহ্বান বলিয়া গণ্য হইবে না। সুতরাং ইসলামের কুরবানীর মানদণ্ড তো এতই উন্নত ও ব্যাপক যে, কোন ব্যক্তি বিশেষ যে নিজেকে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহে যাহাদের কথা বা আহ্বান খোদাতা'লার নিকট সুন্দর ও মধুর বলিয়া সাব্যস্ত হয়—এরূপ ব্যক্তিকে উভয় প্রকারের মানদণ্ডে অবশ্যই পুরাপুরি উত্তীর্ণ হইতে হইবে। অর্থাৎ মালী কুরবানীর দিক হইতেও 'আমলে-সালেহ্' হইতে হইবে এবং প্রাণ সম্পর্কীয় কুরবানীর দিক হইতেও 'আমলে সালেহ্' হইতে হইবে। এতদ্বারা সপ্রমাণীত হইল যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 'নফ্‌স' বা প্রাণের কুরবানী পেশ করা জরুরী এবং আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করাও অনিবার্য কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, সব মানুষ তাহার অন্যান্য কাজ-

কর্মে ব্যস্ত এবং নিজের জীবনের স্থিতিশীলতার উদ্দেশ্যে চেষ্টা প্রয়াসে নিয়োজিত থাকিয়া সে তাহার সম্পূর্ণ 'নফ্‌স' বা প্রাণকে কিরূপে খোদাতা'লার সমীপে পেশ করিতে পারে? এই প্রসঙ্গে কুরআন করীম বিভিন্ন মওকাতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানবহৃদয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে যে, কিছু লোক 'সাবেকুন'—অগ্রগামী হইয়া থাকে, কিছু মধ্যম দর্জার লোক হইয়া থাকে, আর কিছু সংখ্যক অপেক্ষাকৃত পিছনে পড়িয়া থাকা (মন্থর গতি বিশিষ্ট) লোক হইয়া থাকে। মোট কথা, কুরআন করীম উহার বিভিন্ন স্থানে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ এবং তাহাদের কুরবানীর কথা উল্লেখ করিয়া ইহা বুঝাইয়াছে যে, সব লোককেই কোন না কোন রঙে অবশ্যই কুরবানী পেশ করিতে হইবে। কিছু সংখ্যক এরূপ লোক হইয়া থাকে যাহারা নিজেদের সম্পূর্ণ 'নফ্‌স' বা প্রাণকে জামায়াতের সামনে পেশ করিয়া দিয়া আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং নিজেদের সময়ের কোন অংশই অবশিষ্ট রাখেন না। তাঁহারা বলেন, 'আমাদের যাহা কিছুই আছে তাহা সবই খোদাতা'লার। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই দীনের জন্য কুরবান। এখন আমাদের দ্বারা যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে কার্য গ্রহণ করুন, যেভাবে ইচ্ছা খেদমত নিন। আমাদের নিজের বলিয়া কোন কিছু নাই। সব কিছুই খোদার জন্য 'ওয়াক্‌ফ' বা উৎসর্গীকৃত।' এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহাদের দাবীতে পুরাপুরি উত্তীর্ণ হইয়া

থাকেন এবং নিজেদের 'আমলে-সালেহ্'-এর দ্বারা নিজেদের দাবীর সত্যতা সাব্যস্ত করিয়া দেখান। আর কিছু সংখ্যক লোক আছেন যাঁহারা কিছুটা সময় অবশ্যই দিতে পারেন। দুনিয়ার কাজ-কর্মে অনিবার্য কারণ বশতঃই জাতিকে নিয়োজিত হইতে হয়। সমষ্টিগত প্রয়োজনসমূহ পূরণের তাগিদেও দুনিয়ার (পার্থিব) উপার্জন জরুরী হইয়া থাকে। কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্য তাহাদেরও দীনের খেদমতই হইয়া থাকে। সুতরাং যে অর্থ তাঁহারা কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জন করিয়া থাকেন তাহা খোদার হুযুরে পেশ করিয়া দেন এবং এইরূপে তাহারাও নিজেদের দাবীকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়া দেখান। কিন্তু খোদাতা'লা বলেন যে, 'নিজেদের প্রাণকেও আমার সমীপে পেশ করা জরুরী।' বরং (উল্লিখিত আয়াতে) নফ্স বা প্রাণের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেজন্য প্রত্যেক আহ্মদী, যে মালী কুরবানী তো পেশ করিতেছে কিন্তু সময়ের কুরবানী পেশ করিতেছে না—সে কুরআন করীমের উক্ত আয়াত অনুসারে একজন খঞ্জ মুসলমান। তাহার দুইটি পায়ের মধ্যে একটি পা নাই, এবং খঞ্জ হওয়ার কারণে মানুষ তাহার সমষ্টিগত শক্তির দশমাংশেরও অধিকারী থাকিয়া যায় না। অর্থাৎ দুইটি পায়ের মধ্যে একটি কাটিয়া যাওয়াতে তাহার অর্ধেক শক্তিও বজায় থাকে না বরং অনেক সময় একশত ভাগের এক ভাগও থাকে না। সেজন্য নিছক দাবীকারক মুসলমান অর্ধ মুসলমান হইয়া থাকিয়া যাইবে। ইহাতো

এক মস্ত বড় দোষ বা ত্রুটি। সুতরাং পূর্বে যদি নফ্‌স বা বা প্রাণ সম্পর্কীয় কুরবানীর ময়দানে জামায়াতের অতি দ্রুত-বেগে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাহা হইলে আজ তদ-পেক্ষা অধিক ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে।

বাস্তবিকপক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যামানায় কার্যতঃ আমাদের যত জন মোবাল্লেগ কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিলেন আজ তাহাদের তুলনায় দশমাংশও তবলীগের কাজে নিয়োজিত নহেন। পক্ষান্তরে এখন প্রয়োজন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং আমাদের সংযোগ উৎস কেন্দ্র অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ঐ সময় হিন্দুস্তান এরূপ একটি দেশ ছিল যেখানে জামায়াতে আহ্‌মদীয়ার সংযোগ ও সম্পর্ক অধিকতর ক্ষেত্রে ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করার সহিত বিজড়িত ছিল কিন্তু এখন তো জগতে হয়তো গণনায় মাত্র কয়েকটি দেশ এরূপ হইবে যেখানে জামায়াত স্থাপিত হয় নাই। নচেৎ, এমন কোন জায়গা আপনারা পাইবেন না যেখানে জামায়াতের যোগ-সম্পর্ক কোন না কোন রূপে কায়েম হয় নাই অথবা বর্তমানে সেখানে জামায়াত নাই। যেমন, রাশিয়া একটি কমিউনিষ্ট (সাম্যবাদী) দেশ। ইহা সত্বেও যে, সেখানে তবলীগ বা ধর্ম প্রচারের অনুমতি নাই,—সেখানকার একটি পত্রিকা ইহা স্বীকার করি-য়াছে যে, আহ্‌মদীয়া জামায়াত রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও মওজুদ আছে, যদিও নিজেদের মরকাযের সহিত তাহাদের যোগ-সম্পর্ক নাই। সুতরাং যখন আমি বলি যে, জগদ্ব্যাপী

আহ্‌মদীরা বিদ্যমান আছেন—ইহা আমি জ্ঞানের ভিত্তিতেই বলি। ইহা বাস্তব সত্য যে, জামায়াতে আহ্‌মদীয়ার অস্তিত্ব চীনেও আছে, রাশিয়াতেও আছে, পূর্ব ইউরোপেও আছে, বরং পূর্ব ইউরোপের একটি দেশ সম্বন্ধে সমর্থিত তথ্য পাওয়া গিয়াছে এই যে, সেখানে বর্তমানে খোদাতা'লার ফযলে যে সর্বমোট মুসলমান অধিবাসী আছেন তাঁহাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেন আহ্‌মদীয়া জামায়াতের সহিত সম্পর্কযুক্ত মুসলমান। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, (জামায়াতের) সংযোগ উৎস কেন্দ্র যখন প্রসার লাভ করিয়াছে তখন খেদমতের প্রয়োজন এবং চাহিদাও সম্প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বাস্তব ঘটনা যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যামানায় যত সংখ্যায় আহ্‌মদীরা মোবাল্লেগ ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের কাজ করিতেন, সেই তুলনায় আজ ঐ সংখ্যা অনেক কম। তখন প্রতিটি আহ্‌মদীই মোবাল্লেগ ছিলেন, প্রত্যেকেই মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানে নিয়োজিত থাকিতেন। একজন কৃষক যখন ক্ষেতে হাল চাষ করিতেন, তখন তিনি তবলীগ করিতেন। একজন ব্যবসায়ী যখন ঠোঙ্গায় সোডা ভরিয়া গ্রাহকের হাতে বিক্রয় করিতেন, তখনও তিনি তবলীগ করিতেন, একজন হেকিম যখন ঔষধের পুরিয়া তৈরী করিয়া কাহাকেও দিতেন অথবা ডাকযোগে পার্সেল পাঠাইতেন, তখন উহার সঙ্গে তিনি তবলীগ অব্যাহত রাখিতেন। সমাজে যে কোন শ্রেণীর আহ্‌মদী যে কোন স্থানের অধিকারী হউক না কেন—উকিল হউক বা ডাক্তার, ব্যবসায়ী

হউক অথবা পেশাদার, কাঠমিস্ত্রী হউক বা কামার—প্রতিটি স্থানে সে প্রথমে ছিল মোবাল্লেগ এবং তারপর ছিল অন্য কিছু। সুতরাং উক্ত কারণ বশতঃই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'লেকচার লুধিয়ানা' গ্রন্থে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "বয়আতের গণনা ও পরিসংখ্যানের যতখানি সম্পর্ক--দুই হাজার, চার হাজার, ছয় হাজার পর্যন্ত সংখ্যায় বয়আত (ডাক-যোগে) হস্তগত হইয়া থাকে।" মোবাল্লেগ যদি নাই থাকিত তাহা হইলে এই সকল বয়আত কোথা হইতে আসিত? সেই যামানায় প্রতি মাসে ছয় হাজার সংখ্যায় সাধারণ রুটিন (routine) অনুযায়ী অর্থাৎ নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার স্বরূপ বয়আত সম্পাদিত হইত। ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জীবদ্দশায় বার্ষিক বাহাত্তর (৭২) হাজার বয়আত হইত। এতদ্ব্যতীত, কখনও কখনও এমন সময়ও আসিত, যখন অসাধারণ জাঁকজমকের সহিত কোন নিদর্শন প্রকাশিত হইত, তখন সহসা বয়আতের গতিও অসাধারণভাবে বাড়িয়া যাইত। কোন কোন সময় পিওন চক্কর দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িত। একবার বয়আতসমূহের একটি থলে বহিয়া আনিত, তারপর দ্বিতীয়টি আনিতে চলিয়া যাইত, তারপর তৃতীয়টি আনিতে যাইত। এই বরকত এজন্য ছিল যে, 'নফ্‌স'-এর কুরবানীতেও বরকত ছিল। খোদাতা'লার বরকতসমূহ আমাদের কুরবানীর বরকতের সহিত যোগসম্পর্ক রাখে। ইহা ঠিক যে, আমাদের কুরবানীর তুলনায় শত শত গুণ বেশী পরিমাণে আল্লাহ্‌তা'লার

ফযল নাযেল হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা সত্বেও সেই তুলনা-মূলক পারস্পরিক সম্পর্কটি কায়েম থাকে। যদি বলেন যে, উহা এক এবং এক শতের মধ্যকার সম্পর্কের ন্যায়, তাহা হইলে যখন দশটি কুরবানী হইবে, তখন হাজারটি ফযল নাযেল হইবে। এমন তো নয় যে, একটি কুরবানীর পর একশত ফযল এবং দশটির পর এক শতটিই থাকিবে। অতএব, ফযলসমূহ বাড়াইবারও কিছু ভঙ্গিমা আছে সে সকল ভঙ্গিমা এখতিয়ার করিতে হইবে।

বর্তমানে জগদ্ব্যাপী যে খৃষ্টান প্রচারকগণ কাজ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার। আর ইহারা হইল ঐ সকল খৃষ্টান প্রচারক, যাহারা সাধারণ পাদ্রী নয়—যাহারা চার্চে তাহাদের প্রার্থনা পরিচর্যার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে, বরং তাহারা হইল একান্তরূপে (খৃষ্ট ধর্মের) তবলীগ বা প্রচার সংক্রান্ত সংগঠনগুলির সহিত জড়িত এবং তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য তবলীগ ব্যতীত আর কিছু নয়। যদি শুধু তাহাদের বেতনেরই হিসাব করিয়া আপনারা দেখুন, তাহা হইলে বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। এতদ্ভিন্ন আরও অসংখ্য খরচ আছে, যাহা প্রতিটি পাদ্রীর সহিত সংযুক্ত। যেমন, পুস্তকাদি প্রকাশনা, বিনামূল্যে সম্পদ বা অর্থ বিতরণ, বিভিন্ন ধরণের জিনিষপত্র সরবরাহ ও তাহাদিগের কাছে নানা প্রলোভন পেশ করা, হাসপাতাল, স্কুল ও কলেজের দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করা, ইত্যাদি। এগুলিতেই এত মোটা অংক হইয়া পড়ে যে

আমরা উহা কল্পনাও করিতে পারি না। শুধু তাহাদের বেতনের উপরই প্রতি বৎসর শত শত কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। পক্ষান্তরে, বেচারা আমরা তো হইলাম গরীব লোক। আমাদের বার্ষিক বাজেট মাত্র কয়েক কোটির মধ্যে সীমিত। এই সমগ্র টাকাও যদি আমরা মোবাল্লেগের উপর ব্যয় করিয়া দেই এবং এক আনা পয়সাও অন্যত্র খরচ না করি, তথাপি কয়েক হাজারের উর্ধে মোবাল্লেগদের সংখ্যা বাড়িবে না। আর তাহারা (খৃষ্টান প্রচারকরা) হইল দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজারের কাছাকাছি। পরিসংখ্যান পরিবেশনকারীরা হইলেন বিভিন্ন লোক, কিছু কিছু পার্থক্যের সহিত পরিসংখ্যান পেশ করেন। কিন্তু আমি যে খোঁজ লইয়াছি, আমার সেই পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রায় পৌনে তিন লক্ষ নিয়মিত খৃষ্টান প্রচারক বর্তমানে জগদ্ব্যাপী কাজ করিতেছে এবং ইহাদের সহিত যদি মর্মেন চার্চের বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার জীবন-উৎসর্গকারীকেও শামিল করিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত সংখ্যা সোয়া তিন লক্ষে দাঁড়ায়।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে, সোয়া তিন লক্ষের মোকাবিলায় আমাদের সোয়া দুইশত বা তিন শত মোবাল্লেগ কিরূপে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারিবে? ইহার ব্যবস্থা-পত্র কুরআন শরীফ ব্যক্ত করিয়াছে। আর উহা কত সহজ এবং কত পবিত্র ব্যবস্থা পত্র! আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, তোমরা অহ্বান কর আমলে-সালেহ্-এর দাবী ও চাহিদা পূরণ কর। এবং আমলে-সালেহ্-

এর দাবী ও চাহিদায় এ বিষয়টিও শামিল করা হইয়াছে যে, মানুষ যেন নফ্‌সের কুরবানীও দেয় এবং ধন-সম্পদের কুরবানীও দেয়। বরং মুসলমান হওয়ার শর্ত বা সংগায় ইহাও শামিল করা হইয়াছে যে, তাহাকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী হইতে হইবে। ইহা অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে আর কি কথা বলা যাইতে পারে? অন্য কথায়, উক্ত আয়াত ঘোষণা করিতেছে যে, 'তোমরা স্বচ্ছন্দে ইসলামের দাবী কর। ইহাতে তোমাদিগকে কেহ বাধা দেয় না। কিন্তু তোমরা যদি এরূপ ইসলামেরই দাবী করিতে চাহ, যাহা খোদার দৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ সুন্দর ইসলাম, বরং তাহা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ইসলাম, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান হইবে উহার অপরিহার্য ও প্রথম শর্ত। তারপর দ্বিতীয় শর্ত হইল সৎকর্ম। অতঃপর, তোমাদের তখন ইহা বলিবার অনুমতি আছে, হাঁ, 'আমরা মুসলমান।' মোট কথা, মোবাল্লেগদের অভাব বা স্বল্পতার চিকিৎসা আমাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি প্রতিটি আহ্‌মদী নিজেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মোবাল্লেগে পরিণত করে এবং নফ্‌স সংক্রান্ত কুরবানীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তা'লার দিকে আহ্বানকে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেয় তাহা হইলে আপনাদের মোবাল্লেগণের সংখ্যা সমগ্র জগতের খৃষ্টান প্রচারকদের সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যাইবে। বরং কোন কোন জায়গায় এক একটি দেশেই আপনাদের মোবাল্লেগদের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের খৃষ্টান প্রচারকদের সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যাইবে। আর

এই ধারণার বশবর্তী হওয়া যে, মোবাল্লেগ হওয়ার জন্য নিয়মিত জামেয়া পাশ হওয়া জরুরী—ইহা বড়ই বেওকুফি ও নির্বুদ্ধিতা মূলক ধারণা। মানুষ তাহার প্রকৃত স্থান ও মর্যাদা অনুধাবন না করার কারণ বশতঃই এ কথা চিন্তা করে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রতিটি মুসলমান যে জেহাদের ময়দানে প্রবেশ করিতে চায় তাহার সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার বা অস্ত্র হইল দোয়া। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের কাজে নিয়োজিত হয়, তখন সাহায্যও সে খোদাতা'লার নিকট হইতে চায়। সেজন্যই সে প্রত্যহ পাঁচবার নামাযের প্রতিটি রাকয়াতে ایاك نعبد و ایاك نستعین পাঠ করে। অর্থাৎ—হে খোদা! আমি তোমারই ইবাদত করিব। এই ওয়াদা আমি করিয়াছি এবং নিয়ত আমার ইহাই। কিন্তু এখন সাহায্যও আমাকে তোমার নিকট চাহিতে হইবে। তোমার সাহায্য পাইলেই ইবাদতের হক্ আদায় করা সম্ভব হইবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় অস্ত্র তো হই আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য এবং দোয়া। দোয়ার দ্বারা একজন মুসলমান যখন জেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয় তখন সমস্ত দুনিয়ার শক্তি তাহার মোকাবিলায় কোন মূল্য বা মর্যাদা রাখে না। সেজন্য সমগ্র পৃথিবীর আহ্‌মদীগণকে আমি এই ঘোষণাটির মাধ্যমে হুশিয়ার করিতেছি যে, পূর্বাহ্নে তাঁহারা যদি মোবাল্লেগ না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আজকের পর হইতে তাহাদিগকে অনিবার্যরূপে মোবাল্লেগ

হইতে হইবে। ইসলামকে সারা বিশ্বে জয়যুক্ত করার দাবী ও চাহিদা অতি ব্যাপক এবং ইহা এক বিরাট দায়িত্বভার, যাহা জামায়াতে আহ্‌মদীয়ার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। খৃষ্টান জগতকে মুসলমান করা কোন মামুলি কাজ নয়। কিন্তু খৃষ্টান জগতে আরও যে সকল বিকৃতি ঘটিয়াছে সেগুলি এতই মারাত্মক ও ভয়াবহ যে সেগুলির ইসলাহ্ বা সংস্কারের কাজ এক বিরাট পরিকল্পনা সাপেক্ষ এবং চরম ও পরম মেধা, মস্তিষ্ক ও কর্মগত শক্তি সেই ক্ষেত্রে ব্যয় করিতে হইবে।

ইহা এক বাস্তব সত্য যে, বর্তমানে খৃষ্ট ধর্মের ফলশ্রুতিতে বিশ্বে অনেক কদর্য প্রসার লাভ করিয়াছে। বহু প্রকারের রূহানী আত্মিক ব্যাধি শিকড় ধরিয়াছে। কোন কোন ব্যাধি ক্যান্সারের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। দোয়ার ফলশ্রুতিতে যদি আল্লাহ্ চাহেন তবে তিনিই ইসলাহ্ করিতে পারেন। কিন্তু কার্যতঃ মানুষ যতই চিন্তা করে ততই মানবীয় ক্ষমতায় তাহাদের ইস্‌লাহ্ বা সংস্কারের কোন উপায় দেখা যায় না। তেমনি, নাস্তিকতা যতখানি প্রসার লাভ করিয়াছে উহারও প্রকৃত দায় দায়িত্ব খৃষ্ট-ধর্মের উপরই বর্তায়, ইহার জন্য প্রকৃত পক্ষে খৃষ্ট-ধর্মই দায়ী। যেমন, কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে :

كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ـ
(الكهف : ٢)

[অর্থ—(পরিণামের দিক দিয়া) ভয়ঙ্কর কথা। (ঈসাকে খোদার পুত্র বলিয়া) যাহা তাহাদের মুখ দিয়া নির্গত হইতেছে

বস্তুতঃ তাহারা (ইহা) মিথ্যা বই আর কিছুই বলিতেছে না।'—অনুবাদক]

কোন কোন নির্বোধ তখন বুঝে না। তাই তাহারা বলিয়া থাকে, 'আল্লাহ্‌র ইহাতে কি ক্ষতি? আমরা যদি তাঁহার শরীক সাব্যস্তই করিয়া থাকি, তাহাতে কি বা পার্থক্য বা অনর্থ ঘটিয়া যায়? আমরা তাহা করিলে আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছি। তাহাতে খোদা কেন খৃষ্ট-ধর্মের পিছনে এতই লাগিয়া গেলেন? কেন বার বার তিনি এ কথা বলেন যে, তিন খোদা বানাইয়া ফেলিয়াছে! যুলুমের এক শেষ হইল এবং সব যেন উলট-পালক হইয়া গেল! বস্তুতঃ ইহার কারণ এই যে, আপনারা যদি আজিকার সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং মানবীয় অধঃগতির বিচার-বিশ্লেষণ করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, অধিকাংশ ব্যাধির দায়ভার খৃষ্ট-ধর্মের উপরই বর্তায়, উহাই উৎস সাব্যস্ত হয় সকল রোগের। ইহা এক মৌলিক সত্য যে, দৃষ্টি-ভঙ্গী যদি অযৌক্তিক হয়, তাহা হইলে উহার ফলশ্রুতিতে সেই দৃষ্টি-ভঙ্গীর আহ্বান যে বিষয়ের দিকে হইয়া থাকে উহার উপর হইতেও বিশ্বাস উঠিয়া যায়। সুতরাং খৃষ্ট-ধর্ম নাস্তিকতার উদ্ভব ঘটাইয়াছে। খৃষ্ট-ধর্ম কমিউনিজমকে জন্ম দিয়াছে। খৃষ্ট-ধর্ম বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার প্রতিটি প্রবাহের উদ্রেক ঘটাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, খৃষ্ট-ধর্মের মূলগত বিশ্বাস মৌলিকরূপে মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির সহিত সংঘাত লিপ্ত ছিল, উহা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ইহা স্পষ্ট যে, খোদার দিকে

আহ্বানকারীরা যখন একটি অসংগত কথার মাধ্যমে আহ্বান জানাইতে আরম্ভ করে, তখন খোদার অস্তিত্বে আস্থা উঠিয়া যায়। সুতরাং বর্তমান খৃষ্টান জগতের ব্যাপক জরিপের দ্বারা যে পরিসংখ্যান প্রসিদ্ধ আমেরিকান পত্রিকা 'টাইমে' (Time)-প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টান নামধারীদের মধ্যে শতকরা ২২ জন হইল এমন ব্যক্তি যাঁহারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখেন বলিয়া দাবী করেন। আর অবশিষ্ট খৃষ্টান নামধারীগণ খোদার অস্তিত্বেই বিশ্বাসী নয়। এবং যারা খৃষ্ট-ধর্মের তথাকথিত অনুসারী তাহাদের মধ্যে পুঞ্জি-ভূত ব্যাধিও গণনাতীত। সুতরাং না-মাকুল ও অযৌক্তিক দৃষ্টি-ভঙ্গী বা মতবাদের প্রতিক্রিয়াতে জগৎ দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এবং এরূপ ভয়াবহ ফেৎনা সৃষ্টি হয় যাহা মানবজাতির জন্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহা বিস্তৃত বিচার বিশ্লেষণের সময় নয়, কিন্তু ইশারা-ইঙ্গিতে আপনাদিগকে বলিতেছি যে, আপনারা যদি চিন্তা করেন এবং গভীর প্রজ্ঞা সহকারে চিন্তা করেন, তাহা হইলে আজিকার যুগের অধিকাংশ ব্যাধি, সমস্যা ও বিপদাবলী খৃষ্ট-ধর্ম হইতে প্রস্ফুটিত হইতে দেখিতে পাইবেন। সেজন্য খৃষ্ট-ধর্মের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক জেহাদের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং এই জেহাদে প্রত্যেক আহ্‌মদীর অনিবার্যরূপে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি সব আহ্‌মদী এই জেহাদে শামিল হয়, তাহা হইলে আমাদের

প্রচারকদের সংখ্যা তাদের প্রচারকদের অপেক্ষা কয়েক গুণ বাড়িয়া যাইবে।

তবলীগের কাজ করিলে জ্ঞান আপনাপনি আসিয়া যায়। প্রথমে জ্ঞান আহরণ করিয়া তবলীগ করাও ভাল কথা। তবে যাহাদের এরূপ করিবার তওফিক না হয়, এবং অধিকাংশ লোকেরই উহার সুযোগ হইয়া উঠে না, তাহাদিগকে অপেক্ষা বা বিলম্ব ব্যতিরেকেই ময়দানে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এই ক্ষেত্রে দোয়াই আসল বস্তু। আমি দীর্ঘকাল তবলীগের কাজের সহিত জড়িত ছিলাম। আমার অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃত সত্যও ইহাই যে, বড়র চাইতে বড় যে কোন আলেমের চেষ্টা-প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বুনিয়াদীরূপে মুত্তাকী ও দোয়া প্রত্যাশী হয়। পক্ষান্তরে নিরক্ষরদিগকেও আমি দেখিয়াছি, যাহারা দীনের দিক দিয়া বিস্তারিত কোন জ্ঞানের অধিকারী ছিল না, কিন্তু তাহাদের কথায় ও কাজে নেকী ও তাক্ওয়া ছিল, দোয়ার অভ্যাস তাহাদের ছিল—তাহারা সফলকাম মোবাল্লেগ হিসাবে সাব্যস্ত হইয়াছেন। সেজন্য যাহা আসল হাতিয়ার তাহা তো প্রতিটি আহ্মদীর নিকট সংগৃহীত আছে। তারপর সে কেন অবশিষ্ট আর সব জিনিসের অপেক্ষায় থাকে? অবশ্য, যখন তবলীগের ময়দানে তাঁহারা অবতীর্ণ হইবেন তখন ক্রমে ক্রমে আল্লাহ্তা'লা নিজে তাহাদের তরবীয়ত করিবেন, তাঁহাদের মস্তিষ্কে প্রখরতা দান করিবেন, তাঁহাদের জ্ঞানে বরকত নাযেল করিবেন। ইহা এমনই, যেমন

সাধারণ কোন ব্যক্তি যখন কোন কাজ আরম্ভ করে, তখন প্রাকৃতিক বিধান অবলীলাক্রমে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাহাতে তাহার কাজ পূর্বের তুলনায় উন্নতর পর্যায়ে পর্যবসিত হইতে থাকে। যেমন, বাচ্চা—প্রথমে সে হাটিতে শিখে, তারপর দৌড়াইতে আরম্ভ করে। আর যখন সে দৌড়াইতে পারে; তখন পরবর্তীতে সে অনেক বিরাট কীর্তিসমূহ সম্পাদন করিতে শুরু করিয়া দেয়। প্রত্যেক ব্যায়ামের কারণে (উহা ব্যতীত যাহা মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধে মাত্রাতিরিক্ত করা হয়) পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্তির উৎপাদন ঘটে। তেমনি ভাবে, যখন তবলীগের ময়দানে যাইবেন তখন খোদাতা'লা নিজে আপনাদিগকে মযমুন (ধারাবাহিক জ্ঞান-তত্ব) শিক্ষা দিবেন। আর খৃষ্ট-ধর্ম তো এতই অসার, অর্থহীন ও অন্তঃসারশূণ্য এবং এতই অযৌক্তিক যে, কোন আহ্‌মদীর জন্য খৃষ্ট-ধর্মের মোকাবিলায় কোন প্রস্তুতির কি প্রয়োজন? খৃষ্টীয় খোদার পুত্রের মৃত্যু যাহার আকীদার অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে জন্মলগ্ন হইতে, যাহার স্বভাবে এই আকীদা নিহিত হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, যাহাকে মাতৃদুগ্ধের সহিত পান করানো হইয়াছে যে, কোন নশ্বর-মানব জগতে কখনও চিরস্থায়ী জীবন লাভ করিতে পারে না, একমাত্র খোদাতা'লাই হইলেন চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী, সকল নবী ওফাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন—এরূপ আহ্‌মদীর পক্ষে খৃষ্ট-ধর্মের সামনে যাইতে কি লজ্জা বা সংকোচ থাকিতে পারে? বাস্তব সত্য এই যে, খৃষ্টানরা আহ্‌মদীদের দেখিয়া

দেখিয়া পলায়ন করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন এবং নিজের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ অপরাপরের সামনে এ কথাটি উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, 'দেখুন, খোদাতা'লা আমাকে কাস্‌রে-সলীব তথা ক্রুশীয় মতবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলেন এবং ইহার প্রমাণ এই যে, সাধারণ একজন আহ্‌মদী যে আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, যখন সে খৃষ্টান পাদ্রীদের সামনে যায়, তখন তাঁহারা যখন জানিতে পারেন যে এই ব্যক্তি একজন আহ্‌মদী, তখন তাহারা আপনাপনি পালাইয়া যান এবং তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন থাকে না।' আমরা বাল্যকালে নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ইহা সত্বেও যে আমরা সাধারণ ছেলে মানুষ ছিলাম এবং জ্ঞানের দিক দিয়াও কার্যতঃ অপক্ক ছিলাম, তথাপি কোন কোন খৃষ্টান পাদ্রী (যাহাদের নিকট আমরা গিয়াছি) আমাদের সম্মুখে আসিতে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন।

আমাদের স্মরণ আছে, একবার ডালহৌসিতে আমরা একটি চার্চে যাই। তখন আমরা স্কুলে পড়াশুনা করিতাম। সেখানে এক দেশী পাদ্রী সাহেব ছিলেন। তাঁহার সহিত কথা-বার্তা শুরু করিয়া দেই। কিছুক্ষণ পর তাহাদের একজন বড় পাদ্রী আসিলেন। আমার জানা নাই, কোন্ খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের সহিত তিনি সম্পর্ক রাখিতেন, তবে তিনি ছিলেন ইউরোপিয়ান। তিনি যখন আমাদের কথা-বার্তা শুনিলেন তখন কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের কথায় তিনি আঁচ করিতে

পারিলেন যে, আমরা আহ্‌মদী। তিনি আগাইয়া আসিয়া আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে বালকগণ! তোমরা কি জামায়াতে আহ্‌মদীয়ার সহিত সম্বন্ধ রাখ?' আমরা বলিলাম 'হাঁ, আমরা আহ্‌মদী।' তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, তাহা হইলে তোমাদের সহিত আমাদের কথা বলিবার অনুমতি নাই।' এই বলিয়া তিনি আমাদের বিদায় দিলেন।

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে দাবী করিয়াছিলেন, উহা যে সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা আহ্‌মদী বালকরাও স্বচক্ষে দেখিয়াছে। সেজন্য বিচক্ষণ আহ্‌মদীগণ যাঁহারা জাগতিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত এবং সমগ্র জগৎ ব্যাপী ছড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের পক্ষে খৃষ্ট-ধর্মের সম্মুখীন হইতে কি শংকা থাকিতে পারে? তাঁহারা পূর্ব হইতেই তো জ্ঞানগত দিক দিয়া সুসজ্জিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জ্ঞানপূর্ণ সাহিত্য আহ্‌মদীদের মেধা-মস্তিষ্কে এরূপ আলোক সম্পাত করিয়াছে এবং জ্যোতিঃ দান করিয়াছে যে, খৃষ্ট-ধর্মের যিনি অধ্যয়ন করেন নাই তিনিও নিঃসন্দেহে খৃষ্টান পাদ্রীদের মোকাবিলা করিবার উপযুক্ত। সে জন্য কোন অপেক্ষা বা কালবিলম্ব করার প্রয়োজন নাই। শুধু একটু মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন।

আজ হইতে যদি প্রত্যেক আহ্‌মদী ইহা বুঝিয়া লয়—সে উপলব্ধি করে যে, সে যে দেশেই এবং যেখানেই থাকুক—অবশ্যই দুনিয়া উপার্জন তো করিবে, কেননা ইহা ব্যতিরেকে

উপায়ন্তর নাই, জীবন নির্বাহ সম্ভব নয় এবং দীনের খাতিরে কিছু পেশ করার উদ্দেশ্যে তাহার দুনিয়া উপার্জন করা উচিত। কিন্তু সর্বদা সে উহা দৃষ্টির সামনে রাখিবে যে তাহার অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যও হইতেছে মানুষকে আল্লাহ্-তা'য়ালার দিকে আহ্বান করা ও দাওয়াত দেওয়া ; এবং তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের স্বার্থকতা ইহাতেই নিহিত যে, সে খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে জীবিত আছে এবং খোদার দিকে আহ্বানের উদ্দেশ্যেই বাঁচিয়া আছে। এই অঙ্গীকারের সহিত যখন কাজ আরম্ভ করিবেন তখন আপনারা দেখিতে পারিবেন যে, আল্লাহ্তা'লার ফযলের দ্বারা জগতে কত বিপুল সংখ্যায় এবং দ্রুত গতিতে সেই বিপ্লবের উদ্ভব ঘটিতে শুরু করিয়াছে যাহার আকাঙ্খা লইয়া আমরা বসিয়া আছি।

প্রকৃত প্রস্তাবে, সেই বিপ্লব আপনাদের পথ পানে চাহিয়া আছে। আপনাদের আন্তরিক নিষ্ঠার পথের দিকে তাকাইয়া আছে। আপনাদের উচ্চ সাহসিকতার পথ দেখিতেছে। আপনাদের হৃদয়ের দৃঢ় সংকল্পের পথ পানে চাহিয়া আছে। এই সকল জিনিষ ব্যতিরেকে আপনারা যখন সেই বিপ্লবের পশ্চাদ্ধাবন করেন তখন উহা অধিকতর দ্রুত বেগে আপনাদের নিকট হইতে পলায়নপর হয়। আজ যদি দুনিয়ার প্রতিটি আহ্মদী বদ্ধপরিকর হয় যে, তাহাকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বায়ক রূপে খোদার হুযুরে নফ্সের কুরবানী পেশ করিতে হইবে, এবং মানুষকে খোদার দিকে ডাকিতে হইবে, তাহা

হইলে যে বিপ্লব আমাদের নিকট হইতে পলায়নপর দেখা যায়—আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, উহা কোন একটি স্থানে থামিয়া গিয়াছে, তারপর উহা ফিরিয়াছে, অতঃপর, উহা আপনাদের চাইতে অধিকতর দ্রুতবেগে আপনাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে দেখা যাইবে। তখন কেহ বলিতে পারিবে না, 'আমরা বিপ্লবের দিকে বাড়িয়া চলিয়াছি, কিম্বা বিপ্লব আমাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে।' তখন অনেকটা অবস্থা এরূপ হইবে যেমন মা যখন দীর্ঘ কাল পর তাহার বিচ্ছিন্ন সন্তানকে দেখিতে পায় এবং সন্তান দীর্ঘ কাল পর বিচ্ছিন্ন মাকে দেখে, সেই অবস্থায় কেহ বলিতে পারে না যে, তখন কে কাহার দিকে অধিকতর দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে তখন একটি স্বতঃস্ফূর্ত চীৎকার বাহির হইয়া আসে এবং উভয়ে একে অন্যের দিকে ছুটিয়া যায়। ঠিক তেমনি-ভাবে, প্রত্যেক আহ্‌মদী যদি নিজ অন্তরে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় যে, সে খোদার খাতিরেই জীবিত আছে, খোদার খাতিরেই জীবিত থাকিবে এবং খোদার দিকে সে আহ্বান করিতে থাকিবে, তাহা হইলে আপনারা দেখিয়া লইবেন যে, সেই মহান বিপ্লব যাহা আমাদিগকে এই পৃথিবীতে ঘটাইতে হইবে তাহা আমাদের চাইতে অধিকতর দ্রুতবেগে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। উহা আর আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে দেখা যাইবে না।

সুতরাং বন্ধুদের উচিত, তাঁহারা যেন 'আল্লাহ্‌র দিকে

আহ্বানকারী' হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং দোয়া করেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে তদ্রূপ হইবার তওফিক দান করেন।

যামানা অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধ্বংসের দিকে ধাবমান। উহার গতিবেগে যদি বাধা দান করিতে হয় তাহা হইলে উহা আমাদেরই করিতে হইবে। উহার পরিত্রাণের উপায়-উপাদান যদি উদ্ভাবন করিতে হয়, তাহা হইলে খোদাতা'লার হুযূরে আহাজারির মাধ্যমে আমাদিগকেই করিতে হইবে। উহাকে যদি খোদার পদতলে আনিয়া হাযির করিতে হয়, তবে উহা আমাদেরই করিতে হইবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে ইহার তওফিক দান করুন।

খোৎবা সানীয়া প্রদান কালীন হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

এই ঘোষণার পরিশিষ্ট-স্বরূপ এ কথাটিও আমি বন্ধুদের সামনে স্পষ্ট ভাবে পেশ করিতে চাই যে, যাঁহারা দোয়ার জন্য চিঠি লিখেন তাঁহারা যদি নিজেদের চিঠিতে এ কথাটিরও উল্লেখ করিয়া দেন যে, তাঁহারা আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে 'দা'য়ী ইলাল্লাহ্' তথা 'আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বায়কে' পরিণত হইয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত ও আহ্‌বানের কাজ শুরু করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের চিঠির সঙ্গে আমার জন্য ইহাই হইবে উৎকৃষ্ট নযরানা এবং প্রকৃত প্রস্তাবে নযরানার ফিলসফী ও তাৎপর্যও ইহাই যে, কাহারো সহিত মহব্বতের সম্পর্কের কারণে অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত দোয়ার সঞ্চার হওয়া, এবং সম্পর্ক যত প্রগাঢ় হয় তত বেশী দোয়া হৃদয় হইতে নির্গত হয়।

সুতরাং যতখানি আমার অন্তরের সম্পর্ক, আমি আপনাদের প্রতীতির জন্য নিশ্চয়তা দিতেছি যে, "ইহা অপেক্ষা অধিক আদরনীয় নযরানা আমার নিকট আর কোন কিছুই হইবে না যে, প্রত্যেক আহ্‌মদী—সে পুরুষ হউক বা স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা হউক বা বৃদ্ধলোক, আমাকে দোয়ার আবেদনের সঙ্গে ইহা যেন লেখে যে আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে সে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছে যাঁহারা আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান করেন ও যাঁহাদের আমল হইয়া থাকে সালেহ্‌ (বা সৎ) এবং যাহারা আল্লাহ্‌তা'লার ফরমান অনুযায়ী ঘোষণা করেন যে "আমরা মুসলমান।" যখন উক্ত কথাগুলি তাঁহাদের লেখায় আমি পাইব এবং ইহার সঙ্গেই পরবর্তীতে আল্লাহ্‌-তা'লার ফযলক্রমে বয়আতসমূহও আসিতে শুরু হইবে, তখন আপনারা দেখিতে পাইবেন, আমার অন্তর হইতে কিরূপে উচ্ছ্বসিত দোয়া উৎসারিত হয়। শুধু আমার হৃদয় হইতেই নয়, প্রত্যেক আহ্‌মদীর হৃদয় হইতে ঐ সকল ব্যক্তির জন্য ফুটিয়া ফুটিয়া দোয়া নির্গত হইবে। আল্লাহ্‌তা'লা যেন আপনা-দিগকে এইরূপ নযরানা প্রদানকারীতে পরিণত করেন এবং আমাকে ঐ সকল নযরানা কবুল করতঃ সেগুলির হক্‌ আদায়ের তওফিক দান করেন।

অনুবাদ : মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
(সদর মুরব্বী)।

তবলীগের গুরুত্ব

দা-য়ী ইলাল্লাহ্ সংক্রান্ত নির্দেশ পালনের প্রধান উপায় হলো তবলীগ।

তবলীগ তথা ইসলাম বা সত্য প্রচারের গুরুত্ব আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অপরিসীম। তবলীগ প্রধানতঃ যে সব উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ সহায়ক হয় তা হলো:

ক) আত্ম জিজ্ঞাসা ও শোধনে,

খ) মুমেনের জীবনকে সজীব রাখতে,

গ) ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সমস্যাদি উপলব্ধি করতে,

ঘ) হুকুকুল-ইবাদ তথা আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি হক্ আদায়ে খাস করে মানুষকে তার জীবন সার্থক করার পথ দেখাতে। সব মিলে হুকুকুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র প্রতি বান্দার হক্ আদায়ের পথও প্রশস্ত হয়।

তবলীগ জ্ঞানের পিপাসা জাগায় ও উপস্থিত-বুদ্ধি বাড়ায়। আল্লাহ্র তাৎক্ষণিক নিদর্শনও দেখতে পাওয়া যায়। কেউ আহ্-মদীয়াত বুঝতে পারলে বা গ্রহণ করলে বিমল আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। এসব কারণে আল্লাহ্ কুরআন পাকে তবলীগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্নভাবে আমাদেরকে তাকিদ দিয়েছেন। এখানে আমরা শুধু সূরা আসরে প্রদত্ত নির্দেশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। আল্লাহ্ বলেন:

"মহকালের সাক্ষ্য,
মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মাঝে আছে,
কিন্তু ওরা নয়, যারা ঈমান আনে ও
সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে সত্য (গ্রহণের)
ও ধৈর্য (ধারণের) উপদেশ দেয়।

আল্লাহ্ আমাদের কাছে মহাকালকে সাক্ষ্যরূপে পেশ করেছেন। মহাকালের শুরু শেষ, পরিমাণ পরিধি, আমাদের আয়ত্তেতো নেই-ই, কল্পনারও বাইরে। কাল চলে যাচ্ছে না স্থির আছে, আমরা কালের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছি বা উভয়েই চলছি এসব নিয়ে বিতর্কের ঝড় তোলা যেতে পারে। এতে ফায়দা হবে কিনা বা শেষ সিদ্ধান্তে পেঁৗছা কখনও সম্ভবপর কিনা তাও বলা কঠিন। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিতে কালকে অতীত, বর্তমান-ভবিষ্যত এ তিন ভাগে করে থাকি। এ তিন কালের মনুষ্য জাতির কথা কমবেশী বিবেচনা করে দেখলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে, মানুষ ক্ষতির মাঝে ডুবে আছে এবং কারা কিভাবে ক্ষতির হাত হতে রেহাই পেয়েছে।

এ সূরাতে অতি স্পষ্ট ভাবে ঐ সর্বগ্রাসী ক্ষতি হতে বাঁচার পন্থা হিসেবে ঈমান, সৎকর্ম, তবলীগ ও ধৈর্যের কথা বলা হয়েছে যা চিরন্তন সত্য এবং তা আল্লাহ্ বলেছেন যিনি 'ত্রিকাল' তথা সামগ্রীকভাবে মহাকাল সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ।

আমরা ইতিহাসের মাধ্যমে অতীতকে নিজেদের অস্তিত্ব

উপস্থিতি, সক্রিয়তা, জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতার আলোকে ; বর্তমানকে এবং এসবকে ভিত্তি করে নিবিড় চিন্তা ভাবনার দ্বারা ভবিষ্যতকে কিছুটা আঁচ করতে পারি। তা পারি বলেই আল্লাহ্ আমাদের কাছে মহাকালের সাক্ষ্য পেশ করেছেন। এখানে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করে মূল-কথায় যাওয়া যাবে এবং তাতে আলোচ্য বিষয় বুঝতেও সহজতর হবে। বিষয়টি হলো একমাত্র স্রষ্টাই নির্দিষ্ট করতে পারেন আমাদের আচার আচরণের কোন অংশটি কিভাবে তিনি গ্রহণ করবেন। কোনটার জন্য তিনি খুশি হবেন, পুরস্কার দিবেন এবং কোনটার জন্য তিনি অসুখী হবেন, তিরস্কার বা শাস্তি দিবেন।

বিভিন্ন জাতির আচার আচরণ ও উত্থান পতন, নবীগণের আগমন কালে তাঁদের শিক্ষা, আদর্শ, আচার আচরণ এবং তাঁদের অনুবর্তীদের পরবর্তী আচার আচরণ নিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে—তাঁদের সবাই ঈমান আনাকে (আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত রসূলের উপর) অত্যাবশ্যকীয় বলে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ ঈমানকে বাদ দিয়ে কোন কাজ বা আমলকে সৎ বলে গ্রহণ করেন নি। বস্তুতঃ ঈমান আনা দ্বারা আমরা ক্ষতির আক্রমণ হতে বাঁচার সর্বপ্রথম স্তরে প্রবেশ করি। কেননা কোন কাজ কখন কিভাবে, কি গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে তা নিজে নির্দ্ধারণ করলে হবে না। তা আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত নবী মারফত করে থাকেন। অপর দিকে দেখা যায় শুধু ঈমান আনাতেই আল্লাহ্ সন্তুষ্ট নন। তিনি আরো চান

নবীর নির্দিষ্ট পথে আমল করা। বস্তুতঃ আমলই নবীর শিক্ষা ও আদর্শকে আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে প্রতিফলন ঘটায়। তা না হলে ঈমান আনার কোন সামাজিক মূল্য থাকে না। এ হলো ক্ষতি হতে বাঁচার দ্বিতীয় অত্যাবশ্যকীয় স্তর। এতেও হবে না। নিজে নিজে ভাল থাকা বা ভাল কাজ করাই যথেষ্ট নয়। এতে ক্ষতি থেকে বাঁচা যায় না। নিজে বাঁচলেও সন্তান সন্ততিরা বাঁচতে পারে না। সমাজে প্রচলিত অবক্ষয়ের স্রোত তাঁদেরকে ক্ষতির মাঝে টেনে নিয়ে যাবে। তাই প্রচেষ্টা হবে, সমাজে সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকে ব্যাপক করে নতুন সমাজ—ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ হলো ক্ষতি হতে বাঁচার শেষ স্তর। এ স্তরকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে প্রয়োজন হয় ধৈর্যের। ধৈর্য হলো সফলতার জননী-স্বরূপ। ধৈর্যহারা হলে ইতিপূর্বে তিনটি স্তরের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ধৈর্য সব কিছুকে পূর্ণতা দান করে একথা মুমেন কখনও ভুলতে পারে না। উল্লেখ্য যে, নবীগণের কেউ নিজে আল্লাহ্ পাওয়ার জন্য মার খান নি। অন্যদেরকে আল্লাহ্ পাওয়াতে গিয়েই তাঁদেরকে চরম অত্যাচার অবিচার ভোগ করতে হয়েছে! নবীদের প্রতিষ্ঠিত জামায়াতের বেলায়ও তাই হয়েছে। স্মরণীয় যে, আহ্মদীয়া জামায়াতের বেলাতেও এ সবের ব্যতিক্রম হতে পারে না।

এক মাত্র তবলীগের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই 'দা'য়ী ইলাল্লাহ্' হওয়া যায়। এ জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'

(আইঃ) আমাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। এ আহ্বানে সূরা আসরের চিরন্তন আহ্বানই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এতে সাড়া না দেয়া আল্লাহ্ এবং খলীফার আহ্বানের প্রতিই অবহেলা দেখানো হবে। কোন মুমেন কখনও তা করতে পারে না।

বিষয়টিকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে হৃদয়গম করার জন্য গ্রাম বাংলার জীবন হতে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। পুকুরে গোসল করার বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। কেউ গোসল করার ইচ্ছা করেছে। এ স্তরকে 'গোসল স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন' এর প্রতি ঈমান আনা বলা যায়। গোসল করতে যাওয়া ও করাকে আমলের স্তর বলে গণ্য করা যায়। ধরা যাক ঐ পুকুরে শেওলা বা পানা আছে (যা বাংলাদেশে প্রায়ই থাকে)। যদি শেওলা বা পানাকে হাতে ঢেউ দিয়ে না সরিয়ে ডুব দেয়া হয়, ওসব লেগে সারা দেহ ময়লায় ঢেকে যাবে, উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এ অবস্থায় ডুব দেয়ার আগেই হাত দিয়ে ঘনঘন ঢেউ দিয়ে শেওলা বা পানা দূরে সরিয়ে নিতে হয়। এটাকে তবলীগের সাথে তুলনা করা যায়। তবলীগ না করলে সমাজের অবক্ষয়ের ময়লা এসে আমাদের গা-গতরে লেগে যাবে। এসব কাজেও ধৈর্য চাই।

উল্লেখ্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সবে মিলে পুকুরকে সাফাই করা হয়। তখন সারা পুকুরটাই নতুনরূপ ধারণ করে যা সবার জন্য কল্যাণকর হয়। বস্তুতঃ ধৈর্যের সাথে সত্য প্রচারের

দ্বারা সমাজে যখন বেশীর ভাগ লোক মিলে অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন আমরা ক্ষতি তথা অবক্ষয় হতে বাঁচার জন্য দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ পাই। এখানে আরও যে বিষয়গুলো স্মরণ রাখতে হবে তা হলো শুধু ঈমান বা আমল এককভাবে যথেষ্ট নয়। এসবের সাথে প্রচার ও ধৈর্য দ্বারা সমাজকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যারা ঈমান না এনে সামাজিকভাবে স্বীকৃত সৎকাজ করে যায় তাও আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত না হওয়ায় তারাও ক্ষতি হতে বাঁচতে পারে না। বর্তমানে তথা কথিত উন্নত জাতিদের তাই হয়েছে। এক কথায় আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই বান্দার ইচ্ছা হতে হবে।

চলুন আমরা তবলীগ দ্বারা আমাদের আশে পাশে এবং ক্রমাগত বাংলাদেশে এই কল্যাণকর অবস্থা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে-দ্রুত এগিয়ে যাই। আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হউন।

আমীন

খাকসার
এম, এম, আলী
ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

আহ্‌মদীয়া জামায়াতে বয়াত গ্রহণের শর্তাবলী

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

১। এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতা'লার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

২। মিথ্যা, পরদারগমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে ও ইস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

৪। উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায় কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

৭। ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

৮। ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

৯। আল্লাহ্‌তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহমদীয়া জামায়াতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' ত[illegible] সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে [illegible]লাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন —
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)